সংকুচিত হচ্ছে সাংবাদিকতা ?

মফস্বল শহরে আমার সাংবাদিকতা প্রায় ২৮ বছর। এসসসি পাশের গন্ডি পেরিয়ে একাদশ শ্রেনীতে পড়াকালীন সময়ে কুষ্টিয়া জেলা শহর থেকে প্রকাশিত একটি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা দিয়ে আমার হাতে খড়ি হয়েছিল। এরপর বেশ কয়েটি জাতীয় দৈনিক, ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও পরে অনলাইন মিডিয়া। মুলত প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক ও অনলাইন সবগুলো মিডিয়াতে কাজ করার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে।

এর মধ্যে মেহেরপুর থেকে প্রকাশিত এ অঞ্চলের বহুল প্রচারিত দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনের বার্তা সম্পাদক ও গাংনী থেকে প্রকাশিক আমাদের সূর্যোদয় পত্রিকাতে নির্বাহী সম্পাদক হিসেবেও কাজ করার সুযোগ হয়েছে।
সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা আমাকে অনেকটাই গ্রাস করে ফেলেছে বলা যেতে পারে। যাই হোক, সংবাদপত্র, সাংবাদিক পাঠক, রাজনীতিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা নানাবিধ বিষয় নিয়ে আজকে দু একটি কথা লিখবো বলেই কম্পিউটার নিয়ে বসা। একজন সাংবাদিক তার দৈনন্দিন কর্মকান্ডের মধ্যে দিয়ে প্রতিনিয়ত হাজারও পাঠকের বিচারের মুখোমুখি হতে হয়। একজন পাঠক একজন সচেতন সাংবাদিকের কাছে সব সময় বিচারকের আসনে থাকেন। অর্থাত একজন সাংবাদিকদের প্রতিনিয়ত বিচারকের মুখোমুখি হয়ে থাকেন।

বিভিন্ন ঘটনাবলী, বিষয়, ধারণা, মানুষ, প্রকৃতি, পরিবেশ, সমাজ, রাষ্ট্র সম্পর্কিত প্রতিবেদন তৈরি ও পরিবেশন, যা উক্ত দিনের প্রধান সংবাদ এবং তা সমাজে প্রভাব বিস্তার করে। এই পেশায় শব্দটি দিয়ে তথ্য সংগ্রহের কৌশল ও সাহিত্যিক উপায় অবলম্বনকেই সাংবাদিকতা বোঝায়।

সাংবাদিকতা একটি মহৎ পেশা। সংবাদপত্রকে রাস্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভবলা হয়ে থাকে। সাংবাদিকদের দেশ ও জাতির বিবেক,সমাজের আয়না, দর্পণ, বিবেক, তৃতীয় চোখ নানাভাবে বিশেষায়িত করে থাকেন। সাংবাদিকতা পেশা মহৎ ও সম্মানজনক হলেও এটি এখন সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ।

একজন “কলম সৈনিক” সাংবাদিকতা ঝুঁকিপূর্ণ জেনেও পেশাগত দায়িত্ব পালন করে যান। দেশ ও মানবতার কল্যাণে কাজ করতেই সমাজের সকল বিষয়ে জাতির কাছে তুলে ধরতে সাংবাদিকরা কাজ করে থাকেন।

সংবাদদাতা।

এর আগে কুড়িগ্রামের নিজ বাড়ি থেকে ঢাকা ট্রিবিউন সাংবাদিক আরিফুল ইসলামকে তুলে নিয়ে একবছরের জেল দেন জেলা প্রশাসনের মোবাইল কোর্ট।

রাত সাড়ে ১২টার দিকে তাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় ডিসি অফিসের দুই-তিনজন ম্যাজিস্ট্রেট ও বেশ কয়েকজন আনসার সদস্য। তিনজন ম্যাজিস্ট্রেটসহ ১৫-১৬ জন আনসার সদস্য দরজা ভেঙে তার বাড়ির ভেতর ঢুকে আরিফুলকে মারতে থাকে এবং একপর্যায়ে তাকে তুলে নিয়ে যায় সাংবাদিকদের উপর হামলা মালা, নির্যাতন ও হত্যা নতুন কোনো ঘটনা নয়।

অপরাধবিষয়ক যে কোনো সংবাদ, বিশেষ করে যেখানে রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিকভাবে ক্ষমতাবানরা যুক্ত আছেন, তাদের বিষয়ে অনেক অভিযোগ পেলেও এখন আর সেসব অনুসন্ধানে খুব বেশি উৎসাহ পান না সাংবাদিকরা। কারণ অনুসন্ধান করে রিপোর্ট প্রকাশ করলেও ওই রিপোর্টের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় তাকে ফাঁসানো হতে পারে—এমন ভয়ে থাকেন। অর্থাৎ একধরনের স্বনিয়ন্ত্রণ বা সেলফ সেন্সরশিপ সাংবাদিকদের আঁকড়ে ধরছে। এখন কম ঝুঁকিপূর্ণ বা ঝুঁকিমুক্ত রিপোর্ট করবেন।

বস্তুত ‘সাংবাদিকতা’ করা এখন আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে কঠিন। বিশেষ করে ঢাকার বাইরে। ‘সাংবাদিকতা’ শব্দটিকে বন্ধনীর ভেতরে রাখার কারণ এখানে সাংবাদিকতা বলতে প্রকৃত সাংবাদিকতাকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যে সাংবাদিকতার মানে দল-মত-আদর্শ ও ভয়-ভীতির ঊর্ধ্বে থেকে ফ্যাক্ট অনুসন্ধান করে নির্মোহভাবে সঠিক তথ্য বের করে আনার চেষ্টা। যে সাংবাদিকতায় প্রশংসার চেয়ে প্রশ্ন বেশি। যে সাংবাদিকতায় প্রশংসা থাকলেও সেখানে যৌক্তিক সমালোচনা, প্রশ্ন ও সংশয় প্রকাশেরও সাহস থাকে। সেই সাংবাদিকতা করা এখন কেন অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে কঠিন। কেন কঠিন—তার উত্তর খোঁজার জন্য এই লেখা।

রাষ্ট্রের সাধারণ ও নিরীহ মানুষ কাউকে হত্যা করতে পারে না। হত্যা করতে হিম্মত লাগে। সাহস লাগে। হত্যা করার পরে পার পেয়ে যাওয়ার মতো রাজনৈতিক, সামাজিকও আর্থিক সক্ষমতা লাগে। যে সক্ষমতার কারণেই প্রায় এক যুগেও সাগর-রুনির হত্যাকারীদের ধরা সম্ভব হয়নি। এমনকি কারা তাদের খুন করলো সেটিও অধরা।

নিয়ন্ত্রণ আইন। ক্ষমতাবানরা গণমাধ্যমকে ‘সাইজ’ করার জন্য এই অস্ত্রটি ব্যবহারেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

সব আমলে সব সরকারই চায় গণমাধ্যম বা সাংবাদিকরা তার পক্ষে থাকবে। প্রশ্ন বাদ দিয়ে শুধু প্রশংসা করবে। (অসমাপ্ত)

লেখক: মেহেরপুর প্রতিদিনের জৌষ্ঠ প্রতিবেদক

মানুষের গল্প

প্রতিদিন নতুন গল্পের গন্ধের জন্য বাতাস হাতড়াই
নতুন প্রেম, নতুন বিরহ নতুন বিদ্রোহ বিপ্লবের গল্প
কবিতার মত কঠিন- গভীর কিছু আসেনা মাথায়
কিন্তু এলোমেলো হাওয়ায় হারিয়ে যায় গল্পগুলোও প্রেম প্যাচপেচে পচা পাতার মত পায়ের তালুতে
বিরহ খুনির রক্তবর্ণ ভীষণ চোখের সকেটে সেঁটে আছে ভালোবাসার আলোর স্নিগ্ধতা দেখিনা কোথাও
আগুনের আভাস দেখি, পোড়া গন্ধ আসে নাকে
শরীরী নারীর কাছে শুনি অলৌকিক প্রেমের গান
পাশেই এলিয়ে থাকে টাকাওয়ালার ক্লান্ত তৃপ্ত শরীর বিপ্লবের পতাকায় বানানো অন্তর্বাস পরে পরম আরামে প্রাসাদে ঘুমায় একদা তুখোড় তুবড়ি ছোটানো বিপ্লবী বিদ্রোহের মিছিলে মুষ্টিবদ্ধ হাত উত্তোলিত হয় না আর ক্ষমতার কালো কাপড়ে মোড়ানো হাত পাতে ভিখিরি তারুণ্য খুন হতে দেখে ক্ষিপ্র পায়ে পালায় মানবাধিকার নেতা
পড়ে থাকা আহত মানুষ লাফিয়ে ডিঙ্গায় মানবতাবাদী লেখক। আমার গল্পের জন্য গোছানো কোন কাহিনি পাইনা সফল-সুন্দর চরিত্রের বিকাশ ঘটাতে পারি না কিছুতেই আমার গল্পের প্লট দখল করে থাকে অবাঞ্ছিত কাহিনি
আমার গল্পের জমি দখল করে দাবড়ে বেড়ায় ইঁদুর- ছুঁচো আমার আর কোনদিন গল্প লেখা হলো না, মানুষের গল্প।

খেজুর কাহিনী

এই ছেলে তুমি চললে কোথায়?
–মসজিদে যাই,
এক বড়লোক ইফতারিতে খেজুর দেবে তাই!
ও…আচ্ছা,
তোমার বাড়ির ইফতারিতে বুঝি খেজুর নাই?
–না গো বাবু না! আমার আব্বা কি করে খেজুর কিনবে বলো? খেজুর যে হাজার টাকা কেজি!বাপটা আমার মুনিশ খেটে খায়, খেজুর কেনার মত টাকা বাপের কাছে নাই!
বাবু,,,বাপটা আমার বড্ড নিরুপায়!
আচ্ছা বাবু, তুমি কি জানো, খেজুর খাওয়া হালাল না হারাম? –কেন,তুমি জানোনা খেজুর খাওয়া তো হালাল!
খেজুর খাওয়া হারাম হতো যদি!
মনটা খারাপ করতো না মা হাসতো নিরবধি!

লেখক: ছড়াকার, মেহেরপুর প্রতিদিন।

সংস্কার ও মানবিকতার দ্বন্দ্ব: মতি নন্দীর ‘বিজলিবালার মুক্তি’

মানবজীবন দ্বন্দ্বমুখর। ভালো-মন্দ, ধর্ম-অধর্ম, সংস্কার-যুক্তির প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ চলছে সেখানে। এই সংঘর্ষ, চুড়াই-উৎরাইয়ের মধ্যে থেকেই সে তার অস্তিত্ব স্থাপন করে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব নেতিবাচক হলেও কখনও কখনও তা ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে মানবচেতনার উত্তরণ ঘটায়। এই উত্তরণের পথ সহজ নয়। নানা পারিপার্শ্বিক টালমাটাল এসে তাকে আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। তা

থেকেই বেড়িয়ে এগিয়ে চলেছে মানব-সঞ্চরণ। তার অগ্রগতির পথে পাশে পেয়েছে বিশ্বায়ন, রেনেসাঁ। এ শুধু দু’টি শব্দমাত্র নয় জাতির উন্নয়নের মাপকাঠি। বিশ্বায়ন, রেনেসাঁর প্রভাবে মানবপ্রযুক্তির উন্নয়ন তো হয়েছেই। কিন্তু তার চিন্তা-চেতনার সনাতনী ভাবমূর্তির বদল কি ঘটেছে, সে প্রশ্ন থেকেই যায়। পরিচিত গণ্ডী থেকে বের হতে চাইলেই বের হওয়া যায় না। গণ্ডী অতিক্রমের জন্য শুধু পারিপার্শ্বিক সমাজ কিংবা পরিস্থিতি নয়, তাদের সংস্কারের দেয়ালও সামনে এসে দাঁড়ায়, তারা নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে পড়ে। আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে নিজেই নিজের উত্তরণের পথ বের করে খুঁজে আনে।

অপরদিকে সংস্কার মানবজীবনের ফুসফুস। সংস্কারহীন মানবজীবন যেন নিরুদ্যাম প্রবাহ, রসহীন। সৃষ্টির আদি থেকে ধর্মের লাল চোখের কষাঘাতে সে সংস্কার অনেকবারই ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। সে ক্ষতস্থানে প্রলেব দিয়েছে মানবিকতাবোধ, মনুষ্যত্ব। মানবিকতার কাছে পৃথিবীর সমস্ত সংস্কারপূর্ণ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হয়ে ওঠে অচেনা। মতি নন্দী ‘বিজলিবালার মুক্তি’ সেরকমই এক সংস্কারপূর্ণ বাতবরণে দ্বান্দ্বিক মনুষ্যত্বের জয়গানের প্রতিভাস।

হুগলি জেলার ভেনিয়াপুর গ্রামের বিজলিবালা তেতাল্লিশ বছর আগে হাতিবাগানে বিবাহ করে আসার পর থেকে প্রতি বছরই গিয়েছেন উত্তর কলকাতার চৌধুরীদের রাধাবল্লভ ঠাকুরবাড়ির ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রার রথের রশিতে টান দিত। প্রথমে যেতেন শাশুড়ীর সাথে, শাশুড়ীর মৃত্যুর পর স্বামী কৃষ্ণকিশোরের সাথে। সময় থেকে না থাকলেও সংস্কার থেকে যায়। এরপর স্বামীও মারা যান, তবুও বিজলিবালার রথের রশিতে টান দেওয়া থেমে থাকে না। সংস্কারের বশে একাই চলে যান রথের রশিতে টান দিত।

বাঙালীর প্রতিটি উৎসবের সাথে জড়িয়ে রয়েছে বিশেষ কিছু খাদ্য। সেটিও তার সংস্কারের মধ্যে পড়ে। বিজলিবালাই বা বাদ যেতে যাবেন কেন; রথের দিন পাঁপড় ভাজা খাওয়ার সংস্কার তার মধ্যেও রয়ে গিয়েছে। “রথের দিন পাঁপড় খাওয়ার ইচ্ছেটা ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে মহেশের রথ দেখতে গিয়ে মনের মধ্যে সেই যে ঢুকে গেল তারপর এই পঞ্চাশ বছরে দু’-তিনবার ছাড়া সব বছরই মেনেছি।”১ সংস্কার তার এতটাই তীব্র যে পাঁপড় না খাওয়ার কারণটাও তার মনে রয়েছে- প্রথমবার শশুরের মৃত্যু, দ্বিতীয়বার শাশুড়ির অম্লশূলের ব্যথার জন্য হাসপাতালে শাশুড়ির বেড়ের পাশে। এমনকি রথ দেখে ফেরার পথে রিকশা উল্টে পা ভেঙে যাওয়াতে তার তো পাঁপড় খাওয়া না হলেও তাকে হাসপাতালে নিয়ে

যাওয়াতে সহায্যকারী ক্লাবের ছেলেগুলোকে পাঁপড় খাওয়াতে ভোলেন না। “পদ্ম, যাবার সময় পাঁপড় কিনে নিয়ে যাবি। এদের খাওয়াবি তুইও খাবি। পলাশ তোমার ক্লাবের ঘরে এখন থাকবে তো, পদ্ম পাঁপড় ভেজে দিয়ে আসবে, রথের দিনে একটু মুখে দিয়ো।”২ পৌষপার্বণে যেমন পিঠে, জন্মদিনে পায়েস, তেমন রথে পাঁপড় না খেলেই যেন নয়।

পা ভেঙে পড়ে থাকাতে বিজলিবালার পুজো হচ্ছে না। পুজোর ব্যাপারে তিনি ভীষণ নিষ্ঠাবান ও সচেতন যাকে তাকে দিয়ে তিনি তার ঠাকুরদের পুজো নিবেদন করাতে পারেন না- “এসব হল হিন্দুদের আচার প্রথা নিয়ম।… হাজার হাজার বছর আগে মুনিঋষিরা এসব বিধান দিয়ে গেছেন। ওনারাই ঠিক করে দিয়েছেন সমাজে কারা উঁচু, কার নিচু, সেই ভাবেই মানুষ ভাগ রা।”৩ ধর্ম-বর্ণভেদকারী গ্রন্থাদিতে এই শ্রেণীবিভাগ যতটা ছিল বাঙালি তাকে আরও পুষ্ট করেছে। “…বর্ণ বিন্যাস ভারতীয় সমাজ বিন্যাসের ভিত্তি। খাওয়া-দাওয়া এবং বিবাহ-ব্যাপারের বিধিনিষেধের উপর ভিত্তি করিয়া ঢালিয়া সাজাইয়া নূতন করিয়া গাড়িয়াছি।”৪ বর্ণভেদের সেই পুষ্ট রূপ দেখি এখানে। বিজলিবালাকে দেখাশোনা করে পদ্ম। পদ্ম বামুন না, কিন্তু অলকাকে দিয়ে তো বিজলিবালা পুজো করাতেই পারে। পুজোর সময় নতুন শাড়ী পড়ে ঠাকুর দেখতে বের হলেও অলকা প্রতিমাকে প্রমাণ করে না, শাঁখা-সিঁদুর পড়ে না। ‘বামুন ’ হলেও তাই অলকাকে দিয়ে পুজো করানো যায় না- “বামন বামুন ব্রাহ্মণ নয় রে ব্রাম-হো। ওরা ঠাকুর দেবতা মানে না, পুজোআছ্রা করে না, ওদের ধর্ম আমাদের মতো নয়। ওদের বিয়েতে হোম যজ্ঞটজ্ঞ হয় না, পিণ্ডি দেয় না শ্রাদ্ধে।”৫

আপদমস্তক সংস্কারপূর্ণ বিজলিবালা শুধু ইহকাল নয়, পরকালের চিন্তাও করে। বিজলিবালার মৃত্যুর পর পদ্ম বিজলিবালার শ্রাদ্ধের দায়িত্ব না নিতে চাইলে বিজলিবালা গর্জে ওঠে- “তার মানে তুই বলছিস আমার শ্রাদ্ধ হবে না! আমার আত্মার গতি হবে না? আমি প্রেত হয়ে ঘুরে বেড়াব?”৬ ভালোভাবে শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন করার জন্য বিজলিবালার পোস্টাপিসে আর ব্যাঙ্কে যত টাকা আছে সব পদ্মকে দিয়ে যাবে। পুনর্জম্মে বিশ্বাসী বিজলিবালার ভয় পাচ্ছে তাকে কুকুর, ছারপোকা হয়ে না জন্মাতে হয়। রাজার ঘরে জন্ম হলেও তো আবার সেই মানবজন্মের দুঃখষ্ট ভোগ করা তাই তাকে যেন আর জন্মাতে না হয় পদ্ম যেন সেই ব্যবস্থা করে- “পদ্ম একটা কথা দে, গয়ায় গিয়ে আমার পিণ্ডি দিবি। নয়তো আমার মুক্তি ঘটবে না রে, আবার তা হলে আমাকে জন্মাতে হবে!”৭

বাড়িতে ভাড়াটে বামুনের বউ হাসিকে নিজের এগারো বছরের পুরোনো গরদের থানা পড়িয়ে, পুজোর নিয়ম বলে পড়িয়ে নেয় গত পঁয়তাল্লিশ বছরে

প্রায় দু’হাজার বার পড়া মুখস্থ পাঁচালি-
“নারায়ণী বলে শুনো আমার বচন।
আত্মহত্যা মহাপাপ নরকে গমন।।”৮

হাসিকে অত্যন্ত আগ্রহভরে পরিচয় করিয়ে দেয় নিজের রোজকার সকালের ঘন্টা-ভরে কাটানো-শাশুড়ীর থেকে পাওয়া নারায়ণ শিলা যেটি শাশুড়িও পেয়েছিলেন তাঁর শাশুড়ির থেকে, কালীঘাট থেকে আনা গাছকৌটো, পুরী থেকে আনা পাথরের জগন্নাথ সুভাদ্রা বলারাম মূর্তি, তারকেশ্বর থেকে আনা তারকনাথ, গায়ত্রীদেবী, গণেশবাবাজী, বালগোপালোর সাথে। এইসব ঠাকুরদেরতাই যেন বিজলীবালার আত্মার সাথী।

বাড়ির ভাড়াটে হাসি ক্যান্সাররোগে মারা গেলে মন খারাপ হলেও নিয়মগুলো রক্ষা করতে ভোলে না বিজলিবালা। “শ্মশান থেকে ফিরল ওদের জন্য নিমপাতা, মটরডাল, লোহা, ঘুঁটের আগুন সদর দরজায় রাখতে হবে, এসব তো হিন্দুদের সংস্কার, মানা উচিত।৯ কিন্তু এহেন বিজলিবালার সংস্কারের কাছে হার মানে স্নেহত্ব। পদ্ম যখন মৃত হাসির ছেলে ভুটুর গলায় চাবি পড়াতে যায় বিজলিবালা বলে- “ওসব নিয়মটিয়ম রাখ তো। …ও তো এক মিনিটেই গলা থেকে খুলে ফেলবে নয়তো মুখে পুরে দেবে। কাণ্ডজ্ঞান মেনে তো নিয়ম মানবি।১০

সংস্কার-সম্পূর্ণা বিজলিবালার মানবিকতার ছোঁয়া পুরো কাহিনি জুড়েই রয়েছে। স্বামীগৃহে অত্যাচারিতা পদ্মকে আশ্রয় দিয়েছে। রথ দেখে ফেরার পথে রিকশা থেকে পড়ে যাওয়াতে সে রিকশাকে তো ভাড়া দেওয়া হয়ই না, উপরন্ত পিটুনি মারা হয়- এতে বিজলিবালা প্রশ্ন তোলে। অসহায় তপতীকে কাজ খুঁজে দেয়, সেই কাজে টান এলে টাকা দিয়ে নতুন কাজের ব্যবস্থা করে উৎসাহিত করে। প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত ভাড়াটে হাসির অসুস্থতার খরর নিয়েছে। হাসির সন্তান ভুটুর যত্ন-আত্তির করেছে। ভুটু পড়ে গেলে ভাঙা পা নিয়ে হামা দিয়ে এসে দেখেছে- “কী করবো ভাই ছেলেটাকে তো দেখতে হবে। একটা অসহায় বাচ্চা, ভিখিরির ছেলে তো নয় ভদ্র বামুনের ঘরের ছেলে।”১১

বিজলিবালার ধ্যানধারণাতে ছেদ পড়ে যখন হাসিনা বানোর নামে চিঠি আসে বাড়ির লেটার বক্সে। মনে প্রশ্ন জাগে ভাড়াটে হাসি আর হাসিনা এক নয় তো? মনে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। হাসির গলার পাঁচালির সুর কানে ভেসে ওঠে, সে সুর কোনো হিন্দুকণ্ঠী মেয়ের ছাড়া অপরের হতে পারে না ভেবে নিজেকে আশ্বস্ত করে। মনে পড়ে ভাড়া দেওয়ার সময় কি জাতি তারও খোঁজ নিয়েছিল বিজলিবালা, চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণ বলেই থাকতে দিয়েছিল। বিজলিবালার নিষ্ঠান্বিত সংস্কারের জোয়ারে টান

পড়ে, হাসির স্বামী জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী জানায় তার স্ত্রী হাসিই হল হাসিনা বানো। জ্যোতির স্ত্রী মুসলিম বলে তারা এতোদিন ঘরভাড়া পায়নি। হাসি বিজলিবালার ঠাকুর ছুঁয়েছে, পাঁচালি পড়ে দিয়েছে। প্রভিডেন্ট ফান্ডের চিঠির খামের ওপর লেখাটা দেখাটার আগে পর্যন্ত যে ধারণা ছিল বিজলিবালা যেন সেটাই বজায় রাখে।

কিন্তু বিজলিবালার পক্ষে তা সম্ভব নয়। তার লালিত নিষ্ঠবোধ এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। মুসলমানের মেয়ে হাসি শুধু ঠাকুরের সিংহাসনই ধরেনি; লক্ষ্মীর পাঁচালীও পড়েছে, হাসির ছেলে ভুটু নারায়ণ শিলা মুখে দিয়েছিল ওটাই বা কী করবে বিজলিবালা। এক কঠিন দ্বন্দ্ব তার সামনে এসে দাঁড়ায়। শিলাটি শুধু তার গর্ব না, পরিবারের সূত্র স্থাপনকারী ঐতিহ্য। সংস্কারের কাছে তার মানবিকতা পিছিয়ে পড়ে। সবার আগে সদ্য স্ত্রীবিয়োগে শোকাচ্ছন্ন এবং মুসলমান নারীর স্বামী জ্যোতি আর তার সদ্য মা-হারা ছেলে ভুটুকে বাড়ি থেকে বের করার কথা ভাবে সে। তার সংস্কারবোধ তাকে তীব্র আঘাত করে- “…যে আঁচড় আমার বুকে পড়ল তার ঘা তো আর শুকোবে না…আমার এত দিনের ঠাকুর তাকে কত যত্নে আগলে রেখেছি, আমার এত দিনের পুজো এত দিনের ভক্তি সব তোমরা মিথ্যে করে দিলে নস্যাৎ করে দিলে।১২

মানবপ্রেমের কাছে সংস্কার হার মানে। জ্যোতি বাড়ি ছাড়লেও বিজলিবালা ভুটুকে রাখে। মা-হারা ভুটু কোথায় সঠিক যত্ন পাবে সে বিষয়ে জ্যোতিকে পরামর্শ দেয়। হাসির বাবার চিঠি খুঁজে পায় বিজলিবালা। হিন্দু ছেলেকে বিবাহ করার জন্য তারা হাসির সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনি, বিজলিবালার মনে হয় ‘জাত ধর্মটাই বড় হল’। সংস্কার, স্নেহ-মমতার কাছে এসে হার মানে। মমত্ববোধের কাছে বিজলিবালার সংস্কার বিলীন হয়ে যায়। সে উপলব্ধি করে ভালোবাসার কাছে ধর্ম হেরে যায়; মনুষ্যত্বের জয় হয়। ‘…হাসি নিছকই মুসলমান মেয়ে নয়, হিন্দুর বউও নয়, ও একটা মানুষ।’ ভুটুকে তার পরিবারের কাছ, আপনজনদের কাছে ফেরাতে চেয়েছিল, কিন্তু জ্যোতির পরিবার মুখ ফিরিয়ে নেয়।

এরপরে বিজলিবালার মধ্যে এক অন্য মানবতাবোধ দেখা দেয়। সংস্কার আর মানবিকতার দ্বন্দ্ব নয় এ; দুটো সম আসনে উপস্থিত হয়েছে। ছোট্টো ভুটু আবার বিজলিবালার সিংহাসন তছনছ করেছে, নারায়ণ শিলা খাটের তলায়, রাধাকৃষ্ণ মেঝেতে পড়ে। বিজলিবালা মুসলিম মায়ের সন্তান এসব করেছে বলে এবারে আর সেসব ঠাকুর বিসর্জন দেওয়ার কথা ভাবে না। ভুটুকে নিজের উত্তরসূরি ভাবে। পদ্মকে জানায় “তোকে আর গয়ায় গিয়ে

পিণ্ডি দিতে হবে না, মুক্তি দেবার লোক আমি পেয়ে গেছি।”১৩

একজন সংস্কার-পরিপূর্ণা নারীর কাছে তার নিয়ম-কানুন, নিষ্ঠার মূল্য অনেকটা। তার সেই নিষ্ঠাতে আঁচড় লাগতে সেই আঘাত সাধারণত সে সহ্য করতে পারে না। আর প্রসঙ্গ যখন ধর্ম, শিক্ষিত আধুনিক-মনস্ক চেতনাও সেখানে চাপা পড়ে যায়। ধর্মের সংকীর্ণ আবৃত্ত থেকে একমাত্র মানবিকতাই পারে ধর্মকে কোণঠাসা করতে- “মনুষ্যত্ব বুঝিলে ধর্ম্ম সহজে বুঝিতে পারিবে।”১৪ ধর্মকে লেখক এখানে একপাশে সরিয়ে দিয়েছেন। সংস্কারের দ্বন্দ্বে মানবিকতার কণ্ঠরোথ না করে, দ্বন্দ্ব মাথা চাড়া দিতেই সংস্কারের শ্বাসরোধ করেছেন । কাহিনীতে এই দ্বন্দ্বের প্রয়োজন ছিল। নয়তো সংস্কারই একাধিপত্য করত। সংস্কারের আবরণ উন্মোচন করে মানবিকতার উত্তরণ হয়েছে।

তথ্যসূত্র:
১। মতি নন্দী: ‘বিজলিবালার মুক্তি’ (ডিসেম্বর ২০০২), সুবর্ণসংগ্রহ উপন্যাস চতুর্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স,
দ্বিতীয় মুদ্রণ নভেম্বর ২০০৮, পৃ ৩
২। তদেব
৩। নীহাররঞ্জন রায়, রাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ০৭৩, চতুর্থ সংস্করন অগ্রহায়ণ
১৪১০, পৃ ১৬
৪। মতি নন্দী: বিজলিবালার মুক্তি’ (ডিসেম্বর ২০০২), সুবর্ণসংগ্রহ উপন্যাস চতুর্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স,
দ্বিতীয় মুদ্রণ নভেম্বর ২০০৮, পৃ ১৩
৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: ‘বঙ্কিম রচনাবলী- দ্বিতীয় খণ্ড’, ‘বিবিধ প্রবন্ধ’, ‘বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা’, প্রথম
প্রকাশ, শুভম প্রকাশনী, ৭ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-০৭৩, ২০১২, পৃ ৭০৫

লেখক: সহকারী অধ্যপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, সাউথইস্ট বি¬শ্ববিদ্যালয়

মাটি ও মানুষের সম্পর্ক সুন্দর হোক

আমাদের মেহেরপুরের সীমান্ত গ্রাম হরিরামপুর। গ্রামটিতে প্রবেশ মুখে ফসলের জমিন দেখে অনেকদিন আগে দেখা একটি বিখ্যাত তামিল মুভির কাহিনী স্মৃতিতে ভেষে উঠলো। মুভিটির নাম কোনভাবেই মনে করতে পারছিনা। কহিনীটা এমন- নিউইয়র্কে ম্যানহটনের ৭০ তলায় উচ্চপদে চাকুরি করা গ্রামের এক যুবক ফিরে আসে দেশের নিজ গ্রামে। বিকেলে গ্রামে ঘুরতে দেখতে পান বয়োবৃদ্ধ এক কৃষক জমিতে কাজ করছেন। ওই কৃষকের কাছে যুবক জানতে চান- সকলেই কৃষি কাজ ছেড়ে দিয়েছে। আপনি এই বয়সেও কাজ করছেন কেন? বৃদ্ধের সগর্ভ উত্তর। জমিতে ফসল উৎপাদনের কাজ করছি বাবা। কৃষিকাজ ছেড়ে দিয়ে কী খাবো। পরিবারের মানুষকে কী খাওয়াবো। যারা কাজ ছেড়ে দিয়েছে তারা আশা হারিয়ে ছাড়েনি। ক্লান্ত হয়ে ছেড়েছে। তারা যদি ফের জমিনে আসে তবে জমিন তাদের কাছে টেনে নেবে। আমি এই জমিনে জন্মেছি। আর এই জমিনেই মরবো। যুবক গ্রামের বাড়ি ফিরে আসে। একদিন জেলার সরকারি কর্মকর্তাসহ গ্রামের সকলকে একত্রিত করে কৃষিতে মনোনিবেশ করতে বলেন। জানান নিউইয়র্কে ম্যানহটনের ৭০ তলায় বসে বসে তিনি কৃষি নিয়ে ভাবতেন। এই জন্মভূমিতে পা ফেলেই বুঝতে পেরেছি পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের এই কৃষি কাজের সাথে সম্পর্ক আছে। একজন কোটিপতি মানুষের সকালের জ্যাম জেলি পাওরুটি থেকে শরু করে গরিবের জাও ভাত। যাদের বেঁচে থাকার জন্য খাবার দরকার তাদের এই কৃষিকাজের সাথে সম্পর্ক আছে। যাঁরা আমাদের জন্য ফসল ফলাচ্ছে তাদের ও এই কৃষি কাজের সাথে সম্পর্ক ছাড়া আমরা বেঁচে আছি।

এক সরকারি কর্মকর্তা জানতে চান কিসের সম্পর্ক । কৃষক কৃষি কাজ করে। আমরা আমাদের কাজ করি। কৃষক টাকার জন্য, আমরাও টাকার জন্য কাজ করি।

যুবক বলেন- আপনারা বেতনের টাকা না পেলে কী করবেন?
জমানো টাকা থেকে খরচ করবো।
যদি জমানো টাকা ফরিয়ে যায়, ছমাস বেতন না দেয় দখন কী করবেন?
এই চাকুরি ছেড়ে দিয়ে আর একটি চাকরি খুঁজবো।

যদি কৃষকরা তাই ভাবে তখন কী হবে? প্রতিদু‘বছর পর বেতন বৃদ্ধি না হলে আমরা আন্দোলন করি। কিন্তু কৃষকরা বছরের পর বছর ফসল ফলালেও

সোনাভানু, চাচা নুর মোহাম্মদ মল্লিকসহ গ্রামের ৫০জনেরও বেশী মানুষ মারা গেছে (গ্রামবাসীর দাবি)। গ্রামের ১৬৫টি টিউবয়েলের মধ্যে ১৬০টিতেই অতিরিক্ত মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক সনাক্ত হয়েছে। জেলার মানুষ পানির সাথে প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে জেলায় উৎপাদিত সবধরণের খাদ্যসামগ্রির সাথে আর্সেনিকোসিস পান করছি।

মেহেরপুর জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের গত এপ্রিল ২০২৩ শেষ হওয়া এক জরিপে জেলার ১৮টি ইউনিয়নে ৩০ হাজার টিউবয়েলের পানি পরীক্ষা করে ৩ হাজার ৮০৬টি টিউবয়েলের মাত্রাত্রিরিক্ত আর্সেনিক পেয়েছেন।

জনস্বাস্থ্য বিভাগের মতে মেহেরপুর সদর উপজেলার হরিরামপুর, মনোহরপুর, উজ্জলপুর, কুলবাড়িয়া, তেরঘরিয়া, শোলমারি এলাকার মাঠে সেচনির্ভর জমিগুলোতে এমন আর্সেনিকের স্তর চোখে পড়ার মতো। জেলায় মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে সদরে আমঝুপি, বেলতলাপাড়া, বুড়িপোতা, শোলমারি, উজ্জলপুর, সুবিদপুর, গাংনী উপজেলার ভোলাডাঙ্গাও তেতুলবাড়িয়ায়, মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর ও তারানগর গ্রামে। সবচেয়ে বেশী ভয়াবহতা গাংনীর ভোলাডাঙ্গা ও মুজিবনগর উপজেলার তারানগর ও জয়পুর গ্রামের ভূগর্ভস্থ পানিতে। এসব এলাকার জমিতে সেচ দেয়ার পর আর্সেনিকের লাল স্তর ভাবিয়ে তুলেছে মানুষকে। এই আর্সেনিক উৎপাদিত ফসলের মাধ্যমে সচেতনতার অভাবে মানুষ খেয়ে ফেলছে। জেলার জন প্রতিনিধি, বেসরকারি এনজিওর প্রতিবেদন অনুয়ায়ী দুই শতাধিক মানুষ আর্সেনিকোসিস রোগে মৃত্যুবরণ এবং দশ সহস্রাধিক মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন। মেহেরপুর জনস্বাস্থ্য বিভাগ নিরাপদ পানি পেতে গ্রামে গ্রামে নিরাপদ পানির প্লান্ট স্থাপন ও রিং টিউবয়েল স্থাপন করেছেন। গ্রামবাসীদের বিদ্যুৎ বিল দিতে হবে বলে পানির প্লান্ট ব্যবহার না করায় অকেজো হয়ে পড়ে আছে সেসব পানির প্লান্ট।

কৃষি নির্ভর মেহেরপুর জেলা। জেলায় উচ্চ ফলনশীল ধানসহ সেচনির্ভর সারাবছর সবজি চাষ হয়। উচ্চ ফলনশীল ধান ও সবজি চাষে প্রচুর পানি সেচ দিতে হয়। আর এ পানির অধিকাংশই আসে অগভীর নলকূপ থেকে। মাটির তলদেশে এত পরিমান আর্সেনিক যে- সেচ দেয়া জমির ওপরাংশ শুকিয়ে গেলেই চোখে পড়ে জমিতে কী পরিমান তলদেশ থেকে আর্সেনিক উঠে এসেছে। কারণ সেচের ওই জমিতে মাটির উপরাংশ আর্সেনিক স্তর পড়ে লাল হয়ে যাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে আর্সেনিকযুক্ত পানি দিয়ে জমিতে চাষ হচ্ছে বিভিন্ন ফসল। আর সেসব ফসল বিভিন্ন সুপারশপ ও খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে।

প্রাকৃতিকভাবে পানির প্রাপ্যতা কমে যাওয়ায় সেচ নির্ভর চাষাবাদ এখন শতভাগ জমি। এর ফলে মাটির অনেক নিচ থেকে তুলে আনা পানির সঙ্গে আসছে আর্সেনিক। আর এ পানি দিয়ে চাষাবাদের ফলে ফসলেও মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিকের উপস্থিতি ভাবিয়ে তুলেছে কৃষি বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকদের। চিকিৎসকদের মতে অন্যান্য খনিজ পদার্থের মতো আর্সেনিকও মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য সামান্য পরিমাণ প্রয়োজন। আর এই সামান্য পরিমাণ আর্সেনিক প্রতিদিন শাক-সবজিসহ বিভিন্ন উদ্ভিদ জাতীয় খাবারের মাধ্যমে মানুষ পেয়ে থাকে। কিন্তু এর পরিমাণ একটু বেশি হলেই স্বাস্থ্যের জন্য ভয়ঙ্কর বিপদ। কৃষি বিশেষজ্ঞদের দাবি, নদী-নালা, খাল-বিলে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করে শীত মৌসুমে ফসলি জমিতে সেচে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে।

সদর উপজেলার হরিরামপুর গ্রামের আবদুর রহমান একজন কৃষক। তার সবজি চাষের জমিতে দেখা যায় গভির নলকুপ মাধ্যমে সেচ দেয়াতে মাটির ওপর মোটা আস্তরণ পড়েছে আর্সেনিকের। রহমানের মতে জমি চাষ দিলেই এসব রং হারিয়ে যায়। তিনি জানেন না এই আর্সেনিক উৎপাদিত সবজির মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করছে।

একজন কৃষি বিজ্ঞানী বলছেন- কৃষি জমিতে মাত্রাতিরিক্ত সেচের কারনে ব্যাপক ভিত্তিতে ভূগর্ভস্থ্য পানি উত্তোলন হচ্ছে। ফলে সেচের পানি এবং ফসলে আর্সেনিকের উপস্থিতি বাড়ছে। বেশকিছু গ্রামে মারাত্মক ভয়াবহতা দেখা দিয়েছে। বছরের পর বছর ধরে আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করে শত শত মানুষ চর্মরোগ, কিডনি. যকৃত, হার্টের প্রদাহ, স্নায়বিক রোগ, স্থির জন্ম এবং ক্যান্সারসহ মারাত্বক জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন।

জেলার অধিকাংশ মানুষের ভরসা যেখানে জমি, সেখানে মাটির এমন হাল কেন? বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনায় তিনটি কারণ সামনে এসেছে। প্রথম, অতিরিক্ত পরিমাণে রাসায়নিক সার প্রয়োগ। এছাড়া জৈব সারের প্রয়োগ কমিয়ে দেওয়া ও সারা বছর ধরে বিরামহীন চাষও মাটিতে অম্লত্ব বাড়ার কারণ। বিশেষজ্ঞেরা জানান, জেলায় সবথেকে বেশি তামাক, ধান, কফি ও আলু চাষ হয়। প্রতি বছরই উৎপাদন বাড়াতে রাসায়নিক সারের পরিমাণ বাড়িয়ে দিচ্ছেন চাষিরা। ফলে ধান, আলু উৎপাদনের ব্লকগুলিতেও জৈব কাবর্নের পরিমাণ কমে আসছে। হারিয়ে যাচ্ছে উপকারী জীবাণুও।

এনিয়ে কিছুদিন আগে কথা হলো কৃষি বিজ্ঞানী শঙ্কর কুমার মজুমদারের সাথে। তিনি জানালেন- ‘‘মাটিকে বলা হয় খাদ্য শস্যের ভান্ডার। মাটিতে খাদ্যশষ্য জন্মায় এবং সেই খাদ্য মানুষের স্বাস্থ্যের

পুষ্টি ও শক্তি জোগায়। মাটির উপকারী জীবাণু বেঁচে থাকে জৈব কাবর্নের উপর নির্ভর করে। যে ব্লকগুলিতে সব্জি চাষ হয়, রাসায়নিক সার কম প্রয়োগ হওয়ায় সেখানে জৈব কাবর্নের পরিমাণ ভাল। মাটি যত অম্ল হচ্ছে তত হারিয়ে যাচ্ছে উপকারী জীবাণু।” তিনি আরও বলেন ‘বারবার করে বলা সত্ত্বেও চাষিদের বেশিরভাগই মাটি পরীক্ষা না করে চাষাবাদ করেন। কোনও বছর ফসল কম হলে পরের বছর স্বাভাবিক ভাবেই সারের পরিমাণ বাড়িয়ে দেন তাঁরা। ফলে দু’দিক থেকেই ক্ষতি হয়। একদিকে চাষের খরচ বাড়ে, অন্যদিকে মাটিতে অম্লত্ব বেড়ে হ্রাস পায় উর্বরতা। তিনি স্বীকার করেন- কৃষি বাঁচাতে মাটির তলদেশ থেকে পানি সেচ হিসেবে ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। নাহলে আমাদের পানি নিয়ে যুদ্ধ কয়েক কদম দুরে। আর জেলার মাটির তলদেশে আর্সেনিকোসিসের আঁধার। যা উৎপাদিত খাদ্যশষ্য, ফলমূলের মাধ্যমে মানুষকে খেতে হচ্ছে মৃত্যুকে কাছে পেতে।

১৯৮০ সালের গোড়ার দিকে মেহেরপুর সীমান্তের ওপারে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে প্রথম আর্সেনিক দূষণের কথা সবার নজরে আসে। আমাদের দেশের কৃষিবিভাগ ও সরকার সেসময় তৎপর হয়। কিন্তু এই সমস্যা সমাধানে একেবারেই উদাসীন। আর এর জের টানতে হচ্ছে গ্রামীণ এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীসহ সব শ্রেণির মানুষকে। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে পানি ও আর্সেনিকযুক্ত উৎপাদিত খাদ্য গিলতে হচ্ছে আমাদের। এছাড়া আর বিকল্প কিছুই নেই। জেনে শুনে এই বিষপান বন্ধে রাস্ট্রিয়ভাবে আগেই ব্যবস্থা নেয়া দরকার ছিল। এখনও সময় আছে। নাহলে মেহেরপুরের মানষের মৃত্যুই হবে সাথী। মাটি ও মানুষের সম্পর্কর হবে চরম অবনতি। নাহলে হারিয়ে যাবে মাটি ও মানুষের সুন্দর সম্পর্ক।

তোজাম্মেল আযম
লেখক ও সাংবাদিক

তারা আমাকে আলোকস্তম্ভের মতো

পথ দেখায়

পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত-লাগোয়া সবুজেঘেরা ছোট্ট গ্রাম ইছাখালি। মেহেরপুর জেলার অতি সাধারণ একটি গ্রাম। অধ্যাত্মসাধক ও গীতরচয়িতা আরজান শাহ (১৮৮৫-১৯৫৮)-এর জন্ম-মৃত্যু ইছাখালিতেই। তিনি দেশে দেশে গান গেয়ে বেড়াতেন। স্বল্পশিক্ষিত হলেও উচ্চমার্গীয় ভাবুক ছিলেন, আসরে বসেই উচ্চমার্গের গান বাঁধতে পারতেন। প্রতিবছর দোলপূর্ণিমায় আরজান শাহের মাজার ঘিরে মেলা বসে। বছর দুয়েক আগে আমরা কজন বন্ধু আরজান মেলা দেখতে গিয়েছিলোম।

চৈত্রের তপ্ত ধুলো উড়িয়ে, ফসলের মাঠ ভেঙে ইছাখালি-নফরচন্দ্রপুরে আরজান শাহের মাজারপ্রাঙ্গণে যখন পৌঁছালাম, তখন সূর্য মধ্যগগন থেকে বসন্তের উজ্জ্বল রঙ ছড়াচ্ছে। চারদিকে প্রচণ্ড দাবদাহ, কিন্তু মনের ভিতর বসন্তের উতল হাওয়া। চারদিকের উৎসবের আমেজ। কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে হাজারো মানুষের উদ্বেল উপস্থিতিতে মাজার প্রাঙ্গণ জনারণ্যে পরিণত হয়েছে। মেলাপ্রাঙ্গণে উপস্থিত এক বাউল সাধককে জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনার নিবাস কোথায়?’ তিনি বললেন, ‘করিমপুরের গোবরডাঙা, নদীয়া জেলায়।’ আরেকজন বললেন, মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা থানার গোপীনাথপুর। বিএসএফ-বিজিবির বদান্যতায় সীমান্তরেখা পার হয়ে এদের অনেকেই এসেছেন পশ্চিমবাংলার নদীয়া- বর্ধমান-মুর্শিদাবাদের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে।

পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর জেলার দূরপাড়াগাঁ থেকেও অনেকে এসেছেন। ইছাখালি-নফরচন্দ্রপুর গ্রামের পূর্বাংশ ইছাখালির অবস্থান বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানায়, আর নফরচন্দ্রপুর অংশটি পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে। ১৯৪৭ সালে গ্রামটি দু ভাগ হয়ে যায়। অবিভক্ত বঙ্গদেশের মতো একই ট্র্যাজিক নিয়তি বরণ করেছে ইছাখালি-নফরচন্দ্রপুর গ্রাম ও আরজান শাহের মাজার। তারপরও দু পারের মানুষের আবেগ-আত্মীয়তা ভাগ করা যায়নি। বিভেদ-বিভাজনের মধ্যেও রয়েছে মিলনের আকুলতা। আরজান শাহের মাজারটি দু বাংলার সহজিয়া সাধকদের সহজ মিলনের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। দোলপূর্ণিমা উপলক্ষে আরজান শাহের মাজারপ্রাঙ্গণকে ঘিরে দু বাংলার মরমি সাধক ও আত্মীয়-স্বজনদের মিলন মেলা বসে। আরজান স্মরণ দিবস উপলক্ষে মাজারপ্রাঙ্গণে পশ্চিমবঙ্গের এক নিভৃতচারী গায়ক গেয়ে ওঠেন:

‘মানুষ বিনে আর কিছু নাই,
নৈরাকারে ডিম্ব ‘পরে ভেসেছে এই মানুষ গোঁসাই।’

আরজান শাহ-রচিত এই গানের কথা একেবারেই সহজ-সরল ও সাদামাটা। কিন্তু এর ভিতরে রয়েছে উদারতা, যুক্তি, ভক্তি, প্রেম-মানবিকতা এবং মানবমনের অপার কৌতূহল। এই গানের কথায় রাজনৈতিক ভূগোলের পরিসীমা নেই, জাতিধর্মের নামে বাড়াবাড়ি নেই, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি নেই। বাউলরা গানে গানে মানবিকতা ও সম্প্রীতির বাণী ফেরি করে বেড়ায়। সত্তরের অসহযোগ আন্দোলনে ও মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিঝরা দিনগুলিতে সকল ধর্মের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি-সৌহার্দ্য ও ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বাংলার চিরায়ত গানের কথা-সুর দিয়েই আমরা আত্মজাগরণ সৃষ্টি করেছিলাম। তাহলে কী বাঙালির অসাম্প্রদায়িক ভাবনার শিকড় বাংলার লোকায়ত সাধকদের মর্মছোঁয়া চিন্তারাশির গভীরে পোতা আছে আগে থেকেই? হ্যাঁ, তা-ই হবে। আর সেই দর্শন থেকে রস নিয়েই কী আমরা বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সোনা ফলিয়ে চলেছি?

উল্লেখ করা প্রয়োজন, আমাদের আধুনিক চেতনা ও সাহিত্যভাবনার চাতালে যেমন বব ডিলান-জোয়ান বায়াজরা আছেন, তেমনি লালন-হাছনরাও রয়েছেন তাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি জানান্ দিয়ে। বাংলার লোকায়ত মরমি ভাবুকতার ফেরিয়ালা আরজান শাহও আমাদের ভাব-ভাবুকতার পরিধিকে বিস্তৃত করে দিয়ে গেছেন। অথচ আমাদের নগরমনস্ক বিদ্যাজীবীরা তাঁকে ও তার গোত্রীয়দের চিনতেই পারলেন না। আরজান মেলার ভাবগানের আসরে আমারা যারা মেহেরপুর থেকে গিয়েছিলাম তাদের চিন্তা ও উপলব্ধির জগতটি কেমন যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। আমার এক বন্ধু আমাকে বললেন, ‘তোমাকে মেহেরপুরের বাউলদের নিয়ে লিখতে হবে, ছড়িয়ে দিতে হবে তাদের অসাম্প্রদায়িক ভাবনা ও গান। বাংলাদেশকে একটি উদার-মানবিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্যও তাদের ভাবনাগুলে ছড়িয়ে দেয়া দরকার।’

মাজার প্রাঙ্গণে বসেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, অজপাড়াগাঁয়ের সাধকদের অসাম্প্রদায়িক ভাবনা ও তাদের সুরের আগুন মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার। মরমি সাধকদের অসাম্প্রদায়িক ভাবনা পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিতেই লিখে ফেলি ‘ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালির সম্প্রীতি সাধনা’ বইটি। এর পর লিখি ‘বাঙালি মুসলমান সমাজের সংস্কৃতি ভাবনা’। বাংলা একাডেমি প্রকাশিত ‘বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি: মেহেরপুর জেলা’ বইটি লিখি কথাসাহিত্যিক রফিকুর রশীদের সঙ্গে সহ-লেখক হিসেবে। এবারের অমর একুশে বইমেলায় (২০২৪) প্রকাশিত আগামী প্রকাশনীর ‘লালন ফকির: এক নিঃসঙ্গ সাধক’ বইটিও আমার অসাম্প্রদায়িক ভাবনার সোনালি ফসল। বাউলদের সঙ্গ-সান্নিধ্য, তত্ত্ব ও গান আমার কল্পনার আকাশ ও

চিন্তার জমিনকে প্রসারিত করেছে, অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে লিখতে। তাদের আখড়াবাড়ি লাগোয়া গাছগাছালি ও উঠোন, তাদের পরমতসহিষ্ণুতা আমাকে মানুষ ও প্রকৃতিলগ্ন হতে শিখিয়েছে। তাদের গান আমাকে জিজ্ঞাসু করেছে, খোরাক জুগিয়েছে আমার লেখকসত্তার।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলাদেশে অসাম্প্রদায়িক-মানবিক দর্শন এবং যুক্তিবাদী চিন্তাধারা আজ প্রবল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। রাজনীতি ও সমাজে অশুভ সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রভাব-প্রতাপ বাড়ছে, বাড়ছে পরমতের প্রতি অসহিষ্ণুতা ও ধর্মবিদ্বেষ । সেই সঙ্গে বাড়ছে লুণ্ঠন, ভোগবাদ, অবক্ষয় আর অসৎ অমার্জিতদের তাণ্ডব। সবচেয়ে হতাশ ও শঙ্কিত হতে হয়, মানুষের কট্টর অবস্থান ও স্বার্থান্ধতার বাড়াবাড়ি দেখে। তারপরও স্বস্তি ও গৌরবের কথা, বাংলার চিরায়ত সংস্কৃতি ও আমজনতা সব সময় সহনশীলতার পক্ষে, সরল-আটপৌরে জীবনের পক্ষে। এই সংস্কৃতির ধারক ও উত্তরসূরীরা এখনও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। মানবিকতা ও সহনশীলতার সপক্ষে তাঁদের যে-গান তা এখনও আমাদের সমাজে শিরদাঁড়া টানটান করে টিকে আছে। এই গান মানবিকতার পক্ষে আলো ছড়ায়, সাম্প্রদায়িক-সংকীর্ণতা রুখতে কাস্তে শান দেয়। একটি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ না-টেনে পারছি না, আমার দাদা বানী আমিন মাস্টার বিশ্বাসের ও জীবনচর্যায় প্রগাঢ়ভাবে ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি নিয়মিত নামাজ পড়তেন, কোরান তেলওয়াত করতেন এবং রোজা রাখতেন। ইসলামের যুক্তিসিদ্ধ ও শাশ্বত বিধি-বিধানের প্রতি তার ছিল গভীর আনুগত্য। তারপরও তিনি দ্বি-জাতিতত্ত্ব ভিত্তিক ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি সমর্থন করেননি, সমর্থন করতেন শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী, বঙ্গবন্ধুর উদার অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি। নিজ ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি উচ্চকিত আবেগ থাকা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক মানুষ এবং সত্য উচ্চারণে অবিচল। পড়তে ভালবাসতেন রবীন্দ্র-নজরুল সাহিত্য। আবহমান বাংলা ও বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গেও তার ছিল নিবিড় সম্পর্ক।

সাম্প্রদায়িকতা নামক সংক্রামক ব্যাধিটি আমার দাদা অতল হৃদয়কে কখনও স্পর্শ করতে পারেনি, যদিও তিনি সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির শিকার হয়ে গত শতাব্দীর ‘৫০-এর দশকে উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গের নিজ বাসভূমি ত্যাগ করে পূর্ববাংলায় চলে এসেছিলেন। শৈশবে তার কাছে নিয়েছিলাম জীবনপাঠ, সাহিত্যপাঠ এবং মনুষ্যধর্মের পাঠ। তার কাছেই পেয়েছিলাম মওলানা আজাদ সোবহানি ও আবুল হাশিমের মানবিক দর্শনের দীক্ষা। আমার শিক্ষক বাবাও ছিলেন প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ। কৈশোরে বাবার কাছ থেকে নেওয়া গাজ্জালি-রুমি-হাফিজের মিস্টিক

ভাবনা আমার উপলব্ধির জগতটা প্রসারিত করে দেয়। আমার ধর্মপ্রাণ দাদা, আমার আদর্শনিষ্ঠ বাবা এবং অজপাড়াগাঁয়ের মরমিরা ধর্মের সঙ্গে বিশেষত ইসলামের সঙ্গে যুক্তিসম্মত সমঝোতা স্থাপন করে যাপন করে গেছেন সরল অথচ বর্ণাঢ্য জীবন। যুক্তিহীনতা ও ধর্মন্ধতাকে পাত্তা দেননি, যুক্তিবাদী হয়েও ছিলেন ধর্মপ্রাণ। আরজান শাহের মতো বাংলার মরমি ভাবুকরাও যুক্তিবাদী ও তার্কিক, তারপরও যাপন করেন সাদামাটা আটপৌরে জীবন। এরা গরিব হলেও প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ, হীন্মন্যতা এদের স্পর্শ করতে পারে না। আরজান শাহের মাজার প্রাঙ্গণে গিয়ে সেটাই মনে হয়েছিল। মরমি ভাবুকদের তত্ত্ব-আলোচনা, তাদের গানের ঝরনাধারা আমাকে চিনিয়ে দিয়েছে বাঙালির অসাম্প্রদায়িকতা ও মানবিক সম্প্রীতির প্রশস্তপথটির সঙ্গে। সেই পথ ধরেই আমি হাঁটতে চাই সারাজীবন। তাদের ভাব-ভাবনা এখনও আমাকে আলোকস্তম্ভের মতো পথ দেখায়। তাঁরাই আমাকে পড়তে, লিখতে এবং যা-কিছু ভাল তার সঙ্গে থাকতে অনুপ্রেরণা জোগায়।

লেখক: লেখক ও গবেষক। সহযোগী অধ্যাপক, মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর।

দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের জীবন মান উন্নয়ন

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায় কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে এ অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটেছে। পাইলটিং এই প্রকল্পটির কাজ যশোর জেলার, মনিরামপুর উপজেলা ও মেহেরপুর জেলার, সদর উপজেলায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মোট ব্যয় ৪৯ কোটি ৮০ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা।
এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় মোট ৪২টি সমবায় সমিতি গঠন করে, ৪ হাজার ২শ জন বেকার যুবক, সুবিাধাবঞ্চিত মহিলাদের

ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি, বেকার সমস্য দুরীকরণ ও সমাজের পিছিয়েপড়া মানুয়ের ভাগ্য উন্নয়নে প্রকল্পটি অগ্রনী ভূমিকা পালন করছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভিপুর গ্রামের সুবিধাভোগী সদস্য মো: সেন্টু মিয়া ২০২২ সালের ১৫ জুলাই ১ লক্ষ ৫ হাজার টাক্ ◌াঋণ পেয়ে ২ টি ষাঁড় গরু ক্রয় করেন। ১৫ মাস পর তিনি একটি গরু বিক্রয় করে ঋণের টাকা পরিশোধ করেন এবং বাকি একটি গরু তার লাভ হিসেবে রয়েছে। তিনি বলেন, এ প্রকল্পের মাধ্যমে আমি খুবই উপকৃত হয়েছি এবং এই ধরনের প্রকল্প আরও বেশি বেশি বাস্তবায়িত হলে আমার মত অনেকের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটবে।

বাংলাদেশ সরকারের এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রদত্ত ঋণের কোন প্রকার সুদ প্রদান করতে হয়না। শুধু মাত্র ৩% সার্ভিস চার্জে ঋণ পরিশোধের পর ঘুর্ণায়মান তহবিল হিসেবে প্রকল্পের অর্থ হতে পুনরায় ঋণ প্রদান করা হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার সুবিধাভোগী সদস্যদের ভাগ্যে উন্নয়নের পাশাপশি দুধ ও মাংস ঘাটতি পুরনে প্রকল্পটি অনবধ্য ভুমিকা পালন করছে।

লেখক: জেলা সমবায় কর্মকর্তা, মেহেরপুর।

গুজবের গণমাধ্যম এবং মেহেরপুর প্রতিদিন

কুকুরে মানুষ কামড়েছে এটা নয় বরং মানুষে কুকুর কামড়েছে সেটাই খবর। এই চটুলকথনের বাস্তবতা নিঃসন্দেহে পাঠক আকর্ষণের উপযোগী হতে পারে, কাটতি বাড়তে পারে। যেমনটি টেবলয়েড পত্রিকার ক্ষেত্রে হয়। যার একমাত্র উপজীব্য রিউমার। গুজব ছড়িয়ে যেমন সিনেমা সেলিব্রিটিদের ধরাশায়ী করা যায়, আবার কাওকে বানিয় দেয়া যায় রাতারাতি বিখ্যাত। শুধু সিনেমা কেন রাজনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি সবক্ষেত্রেই এ গুজবকে পৃথিবীব্যাপী কাজে লাগানো হচ্ছে।

পল গোয়েবলস গুজবের উদাহরণ হয়ে আছেন ইতিহাসে। কী দারুণ প্রতাপে নিয়ন্ত্রণ করেছেন রাজনীতি, গতিপথ পাল্টে দিয়েছেন অর্থনীতির।

প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে গোয়েবলস গুজবকে কাজে লাগিয়েছেন মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে।

বর্তমানে চারপাশে তাকালে গোয়েবলসকে রাজনীতির মাঠে হাটতে দেখা যায়, ধর্মগুরুদের মাঝে গোয়েবলস উঁকি দেন। চারিদিকে তাকালে গোয়েবলস গোয়েবলস গোয়েবলস!

বর্তমানে দেশের গণমাধ্যম দুভাগে বিভক্ত। একভাগে মিথ্যাকে উপস্থাপন করা হয় সত্যের মতো করে; আর একভাগে সত্যকে ডুবিয়ে দেওয়া হয় মিথ্যার অতলান্তে। দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশের গণমাধ্যম রাজনীতি ও রাজনীতিকদের একধরণের চরিত্র প্রচার করে চলেছে, যে কারণে ভয়ানক ডিক্টেটরও এখানে ভীষণ ডেমোক্রেটিক। অথচ গণমাধ্যমকে বলা হয়ে থাকে চতুর্থ স্তম্ভ। ঘুষ, দূর্নীতি, চাঁদাবাজি, খুন, ধর্ষণের বিস্তার সামাজিকীকরণের পর্যায়ে চলে গেছে। সহজভাবে বলতে গেলে গা সওয়া হয়ে গেছে। অটোরিকশা চালক, লাউ বিক্রেতা যে যার জায়গা থেকে সুবিধামতো অনিয়ম করে চলেছে। যা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কণ্টকিত করে তুলবে।

আপাতদৃষ্টিতে উদ্ধৃত কুকুর কামড়ানোর দৃষ্টান্তের প্রমূল্য রয়েছে । বর্তমানে দুশো টাকা ঘুষ, চারশত টাকার জোচ্চুরি কিংবা হাঁস চাষের সফলতার খবর কোনো খবর নয়। বরং সামাজিক কাঠামো ভেঙে পড়ার পেছনে কোন দানবীয় শক্তি দায়ী তার অনুসন্ধান করা এবং বিশ্লেষণী প্রতিবেদন হাজির করা। গণমাধ্যমের থাকতে হয় সুক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ আর নির্মোহ বিশ্লেষণের ক্ষমতা ।

অনেক কিছুর ওপর থেকেই সাধারণ মানুষের নির্ভরতা চলে গেছে, একমাত্র গুটিকয়েক গণমাধ্যমের উপর খানিকটা আস্থা বেঁচে আছে এখনো। তাদের মধ্যে মেহেরপুর প্রতিদিন অন্যতম।

মেহেরপুর প্রতিদিন তার বস্তুনিষ্ঠতার জন্যে ইতোমধ্যে মামলা হামলায় আক্রান্ত হয়েছে। পাশাপাশি সফলতার দৃষ্টান্ত ও কম নয়, তাদের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ হলে স্বপ্রণোদিত হয়ে মহামান্য আদালত মামলা করেন, যার ফলে ভুক্তভোগীরা তাদের ন্যয্যতা ফিরে পান। এ অঞ্চলের মানুষের একমাত্র কন্ঠস্বর মেহেরপুর প্রতিদিন। বহুল প্রচারিত এই পত্রিকা এভাবেই সুষমসহযোগীতা দিয়ে মানুষের পাশে থাকবে এমনটাই প্রত্যাশা।

লেখক: হাসান রুদ্র (শিক্ষক ও কবি)।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সম্ভাবনার দ্বার খুলে গেছে।

বর্তমানে প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নয়ন ও দ্রুত পরিবর্তনের সক্ষমতা বোঝাতে গিয়ে নিম্নোক্ত কথাটি স্মরণ করা যেতে পারে।
“পাঁচ কোটি লোকের কাছে রেডিওর পৌঁছাতে লেগেছে ৩৮ বছর, টেলিভিশনের ১৩ বছর। অথচ ইন্টারনেটের লেগেছে ৪ বছর। আইপডের জন্য সময়টা মাত্র ৩ বছর আর ফেসবুকের? ২৪ মাস”। ‘কোডাক’ ক্যামেরা, মার্ফি রেডিও, এইচ এম টি ঘড়ি, এ্যাম্বাসেডর গাড়ি, প্রভৃতির কথা মনে আছে নিশ্চয়ই। একসময় দাপটের সাথেই এরা রাজত্ব করেছে। গুনে-মানে ভাল হলেও বছর বিশেকের মধ্যে দেউলিয়া হয়ে গেছে। কারণ প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষ এখন এক স্মার্ট ফোন দিয়েই দশ ডিভাইসের কাজ সারছে।

এই পরিবর্তন আর সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হলে উপযুক্ত জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা দরকার। কর্মবাজারের কথাই ধরা যাক। পি ডব্লিউ সি নামের একটি চিন্তক প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, স্বয়ংক্রিয়করণ ও রোবটিকসের পাল্লায় ২০৩০ সালে বিশ্বের ৮০ কোটি বর্তমান চাকরিই নাই হয়ে যাবে। স্বভাবতই আমাদের মতো শ্রমনির্ভর অর্থনীতির দেশগুলো বিপদে পড়বে। অন্যদিকে নতুন ১০০ কোটি কর্মসৃজন হবে, তবে সেগুলো কেমন, তার বেশির ভাগই আমরা কল্পনা করতে পারছি না। মাত্র এক দশক আগেও কেউ ভাবতে পারেনি, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে লোককে ‘ফেসবুকে নজর রাখা’র জন্য চাকরি দেওয়া হবে।

আমাদের চলমান ব্যবস্থায় ২০৩০ সালে আমরা এমন সব গ্র্যাজুয়েট তৈরি করব, সমাজে যাদের কোনো চাহিদাই থাকবে না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে মোকাবিলা করতে হলে আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার খোলনলচে পাল্টে ফেলতে হবে; সৃজনশীলতা এবং বিশ্লেষণী ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে হবে; শিক্ষাকে করতে হবে অ্যাকটিভিটিনির্ভর এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে।

এই প্রেক্ষিতে মেহেরপুরের শিক্ষার সামগ্রিক অবস্থা কী এবং আমরা কতটুকু প্রস্তুত তা বোঝার জন্য শিক্ষার অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। কৃষি অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল এখানকার গণমানুষ এখনও শিল্প কারখানা, ব্যবসা বাণিজ্য এবং চাকরী-বাকরীর প্রতি অনুরাগী হতে পারেনি, মানসিকতার বদল হয়নি। এখানে বিদেশযাত্রা নিয়ে তরুন যুবকরা যতটা আগ্রহী ততটা শিক্ষা নিয়ে নয়। যে কারণে মেহেরপুর জেলায় শিক্ষার হার মাত্র ৬৬.৭% (২০২২ এর আদমশুমারী অনুযায়ী)।

সরজমিনে পরিদর্শন ও খোঁজ খবর নিয়ে মেহেরপুরের শিক্ষাচিত্র পর্যালোচনা করলে যে বিষয়গুলি দৃষ্টিগোচর হয় তাহলো:
১. জেলার ৫০০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৫১ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা এবং ১৩টি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় সবকটির উন্নয়ন হয়েছে। আধুনিক, উন্নত ও দৃষ্টিনন্দন একাডেমিক ভবন নির্মিত হয়েছে যা প্রত্যন্ত অঞ্চলেও দৃশ্যমান। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে, পাঠদান পদ্ধতিতে প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে।

২. ডিজিটাল বাংলাদেশ এর সক্ষমতা সবচেয়ে বেশি প্রযুক্ত হয়েছে শিক্ষাক্ষেত্রে। ভর্তি প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে পরীক্ষার ফল প্রকাশ-সবই এখন অনলাইনে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরূম ও শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।মেহেরপুরে ইতিমধ্যে প্রায় ৬০% প্রতিষ্ঠানে এই ল্যাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রায় ৭০% প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১০০% বিদ্যালয়ে পাঠাগার এবং বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার স্থাপিত হয়েছে।

৩. মেহেরপুরে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী দ্রুত কমছে। বিজ্ঞানের প্রতি এই অনাগ্রহ গ্রামাঞ্চলের স্কুল-কলেজগুলোতে আরও বেশি প্রকট। দু’বছরআগে দেখা গেছে, মাধ্যমিকে প্রায় ২২ শতাংশ ও উচ্চ-মাধ্যমিকে ১৭ শতাংশ শিক্ষার্থী বিজ্ঞান পড়ছে।গত বছর যশোর বোর্ডের অধীনে মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞানে পড়াশোনা করেছে মাত্র ২০.৭২%, এইচএসসি পরীক্ষায় ১৪.৮%। দেশে প্রযুক্তি শিক্ষার হার ১৫%। মেহেরপুরের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

৪. ইউনেসকোর মতে, মানসম্পন্ন শিক্ষা মূলত যে তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে- তার প্রথমটি হচ্ছে শিক্ষক। সারা দেশের ন্যায় মেহেরপুরেও দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে। পাঠদান, প্রশ্নপ্রণয়নওপরীক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রেশিক্ষকদেরইসৃজনশীলতারঅভাবরয়েছে।ফলে শিক্ষার গুণগত মান আশানুরূপ বৃদ্ধি হয়নি।

৫. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি চর্চার অভাবে শিক্ষার্থীদের প্রকৃতপক্ষে মানসিক বিকাশ ঘটে না। একজন ছাত্রের পরিপূর্ণ বিকাশে যে সকল সহপাঠ্যক্রমের সুযোগ ও সুবিধা থাকা উচিৎ তা অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অপ্রতুল।মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গী ও সামাজিক সমস্যা নিরসনে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড আরও বৃদ্ধি করা উচিত।

৬. শিক্ষার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনসাধারণ ও অভিভাবকের ভূমিকা খূবইগুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে স্থানীয় সুশীল-শিক্ষিত মানুষের অংশগ্রহণ বেড়েছে। তবে মেহেরপুর জেলার অনেক বিদ্যালয়ে এখনও প্রধান শিক্ষকের ব্যবস্থাপনায় এবং স্কুল ম্যানেজিং কমিটি গঠনে অনিয়ম, দুর্নীতি আছে বলে জানা গেছে। এক্ষেত্রে শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নজরদারী বাড়াতে হবে।

৭. জেলায় চারটি সরকারী স্নাতক পর্যায়ের কলেজ ও ৩টি সরকারি টেকনিক্যাল কলেজ আছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রায়শ: শিক্ষক স্বল্পতায়পাঠদানে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। এ সমস্যার দ্রুত সমাধান প্রয়োজন। প্রস্তাবিত মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে গণমানুষের মধ্যে বিপুল আশা-আকাঙ্খার সৃষ্টি হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

৮. এনটিআরসি’র মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি কমে গেছে। তবে মেধাবী শিক্ষাথীদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করতে আরও পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের যোগ্যতাভিত্তিক বেতন প্রদান ও আর্থিক পুরষ্কার প্রদানের মত উন্নত ব্যবস্থা সুফল বয়ে আনতে পারে।

৯. মেহেরপুর জেলায় সরকারি ও বেসরকারী মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রায় ১৫১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করছে প্রায় ৭৫ হাজার শিক্ষার্থী। মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলায় টেকনিক্যাল কলেজ ও জেলা সদরে টিটিসি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার এবং ছহিউদ্দীন টেক্সটাইল ইন্সটিটিউটের নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে।ফলে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার আওতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জেলায় মন্ত্রী থাকায় অনেক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।তরুন শিক্ষার্থীদের ওপর নির্ভর করছে আমাদের আগামী দিনের আর্থ-সামাজিক অবস্থা। এদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে বদলে যাবে মেহেরপুর। সেক্ষেত্রে কারিগরী শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি দূর করতে হবে।

আজ আমরা গ্লোবাল ভিলেজের বাসিন্দা। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অগ্রগতির সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে আমাদের বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথেই এগিয়ে যেতে হবে। শিক্ষা, জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলতে শিক্ষানীতি-২০১০ এর পূর্ণ বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই।

তথ্য সূত্র:
১. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর
২. জেলা শিক্ষা অফিস, মেহেরপুর
৩. মুনীর হাসান: চতুর্থ শিল্প বিপ্লব।

লেখক: প্রফেসর হাসানুজ্জামান (মালেক), সভাপতি, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ, মেহেরপুর জেলা শাখা।

মেহেরপুরকে সমৃদ্ধ করতে পত্রিকাটিকে বেশি ভূমিকা রাখতে হবে

মেহেরপুরকে সমৃদ্ধ করতে মেহেরপুর প্রতিদিনকে বেশি বেশি ভূমিকা রাখতে রাখতে হবে। জেলার শিক্ষা,শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধ ও উন্নয়ন তুলে ধরে পথ্রিকাটিকে গণমানুষের মুখপাত্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। দৈনন্দিন সংবাদের পাশাপাশি অনুসন্ধানমুলক সংবাদ পরিবেশন করে পাঠকের হৃদয়ে ঠায় করে নিতে হবে। জেলার উন্নয়ন অনিয়ম দুর্ণীতি, কৃষি, শিক্ষা সার্বিক বিষয় তুলে আনারও তাগিদ দেওয়া হয়।

মেহেরপুর প্রতিদিনের সপ্তম বর্ষে পদার্পন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় এসব মতামত তুলে ধরেন জেলার বিশিষ্টজনেরা।

গতকাল বুধবার (২৭ মার্চ) মেহেরপুর প্রতিদিনের সভাকক্ষে এই আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক ও আনিশা গ্রুপের চেয়ারম্যান শিল্পপতি এমএএস ইমন আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন।

পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন।

আলোচনা সভায় মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মহা:

বছর পার করেই আজকের এই অবস্থানে পৌছেছে।

তিনি বলেন, স্বাধীনতার সূতিকার মেহেরপুর জেলার পত্রিকা প্রকাশের পথচলা শুরুটায় ছিল নানা জটিলতা। তিনি বলেন এখন মিডিয়া ইমেজ নাই বললেই চলে। এখন ফেসবুকে পেজ খুলেই সাংবাদিক হয়ে যাচ্ছে। মেহেরপুর প্রতিদিন মেহেরপুরে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সততা ও সাহসিকতার সাথেই মেহেরপুর প্রতিদিন এগিয়ে যাবে। তিনি বলেন হোটেল আটলান্টিকা, অনলাইন জুয়াসহ নানা অসঙ্গতি তুলে ধরায় অনেকে হোঁচট খেয়েছে তারা। মেহেরপুর প্রতিদিন তার স্বকীয়তা বজায় রেখে মেহেরপুরে একটি বিপ্লব ঘটাবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কলম ধরবে। ভালোবাসা ও পাশে থাকার জন্য জেলার সকল শ্রেনী পেশার মানুষকে অনুরোধ করেন।

সিনিয়র সাংবাদিক রফিক উল আলম বলেন, শুরু থেকে মেহেরপুর প্রতিদিন অত্যন্ত সাহষিকতার সাথে সংবাদ পরিবেশন করে আসছে। তারা কোনো সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে ঝোল টানাটানি করেনা। পত্রিকাটি আগামীতে দূঢ়তার সাথে এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা করেন তিনি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন অব আব্দুল মালেক বলেন, মেহেরপুর প্রতিদিনের সকল দৈনতা কাটিয়ে আগামীতে স্ব মহিমায় এগিয়ে যাবে।